নীল বিষ

পর্নোগ্রাফি থেকে পরিত্রাণের উপায়

কন্টেন্ট অনুবাদ

সাদিকুর রহমান খান | আবু বকর সিদ্দিক

ফাহিম আহমেদ | রাকিব হাসান ফাহিম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

অন্ধকারের নীল গহ্বর

ইঁদুরের গল্প ১৩
মানুষ কেন পর্নাসক্ত হয় ১৬
গোপনীয়তা থেকে স্বাধীনতা ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুক্তির প্রথম ধাপ

পর্নাসক্তির স্তরসমূহ ৩০
নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চান ৪১
দ্যা পাওয়ার অব অ্যাকাউন্টিবিলিটি পার্টনার ৪৫
পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ৫১
আপনি ঠিক তা-ই, যা খাবার হিসেবে গ্রহণ করেন ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

সময়কে ভালো কাজে লাগানো

কেবল ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট নয় ৬৭
বিষণ্নতার মোকাবিলায় শৌখিনতা ৭২
আত্মমর্যাদা গঠনে শৌখিনতা ৮০
বুদ্ধিবৃত্তিক শৌখিনতার প্রতি আগ্রহ ৮৪
কেমন হতো, যদি সাধারণ জিনিসে আনন্দ পাওয়া যেত ৯০
বাস্তবে কখনো মহৎ কাজ প্রত্যক্ষ করেছেন ৯৪
সামাজিক কাজের মাধ্যমে যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ৯৯

চর্তুথ অধ্যায়

নতুন অভ্যাসের সূচনা

প্রোডাক্টিভ অভ্যাস গঠন ১০৬

পঞ্চম অধ্যায়

নীল বিষ পান

নীল বিষের কবলে ১২১
নীল বিষের ছোবল ১২৮

প্রথম অধ্যায়

অন্ধকারের নীল গহ্বর

ইঁদুরের গল্প

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে এক ইঁদুর বাস করত। তার দিন-রাত কেটে যেত ছোট্ট অন্ধকার খাঁচার ভেতর। অন্ধকার, দুর্গন্ধ ও নোংরা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। একাকিত্ব তাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল। তাকে ছোটো বাটিতে করে কুসুম গরম পানি ও খাবার দেওয়া হতো।

তার চারদিকে ছিল একই রকম আরও অনেকগুলো খাঁচা। প্রত্যেকটি খাঁচায় ছিল তারই মতো একটি করে ইঁদুর। আবার প্রত্যেকের জন্য থাকা-খাওয়ার একই বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তারা একে অপরকে দেখতে পেত না। তাই 'একাকিত্ব' প্রত্যেকটি ইঁদুরের জীবনকেই বিষিয়ে তুলেছিল।

একদিন সকালে ইঁদুরটি এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হলো। হঠাৎ সে দেখল, তার খাঁচায় দুটি পানির পাত্র। শূন্য খাঁচায় পানির পাত্র দেখে সে খুব অবাক হলো। সেই দুইটি পাত্রের একটি পাত্রে ছিল নিত্যদিনের কুসুম গরম পানি, আর অপরটিতে ছিল নীল বর্ণের এক অদ্ভুত পানীয়। সে উভয় পাত্রেরই ঘ্রাণ নিল। একটু চেকে দেখল। প্রথম পাত্রে যেহেতু পানি ছিল, সেহেতু এই স্বাদ-গন্ধ তার কাছে পরিচিতই। কিন্তু নতুন পাত্রের পানীয়? এই জিনিসের স্বাদ এমন কেন? স্বাদে যেমন জঘন্য, গন্ধে তেমনই উৎকট।

প্রথম প্রথম এই অদ্ভুত নীল পানীয় তার পছন্দ হলো না; বরং মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই গলা ধরে এলো এবং ঝাঁঝালো গন্ধে নাক-মুখ জ্বলা শুরু করল। বলাই বাহুল্য, এটি ছিল

একটি নেশাজাতীয় তরল। তো, অল্প একটু নীল তরল পান করার পরই তার মাথা ঘোরা শুরু করল। ফলে সারাদিন সে মনমরা হয়ে পড়ে রইল।

দ্বিতীয় দিনও তার কাছে পানীয়টা খারাপই লাগল। তবে সেই খারাপ লাগার পরিমাণ ছিল আগের দিনের চেয়ে কম। তৃতীয় দিন খারাপ লাগাটা আরও কমে গিয়ে একটু একটু ভালো লাগা শুরু হয়ে গেল। এভাবেই ধীরে ধীরে সে এই নতুন পানীয়র প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। একটা পর্যায়ে সে চরমভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তার একাকিত্ব ভোলার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল এই নীল রঙের অদ্ভুত পানীয়।

কিছুদিন পরের আরও একটা সকাল। ইঁদুরটি এবার নিজেকে আবিষ্কার করল অন্য আরেকটা জগতে। ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করল—সে একটি পরিষ্কার বিছানার ওপর বসে আছে। তার চোখের সামনে এক স্বর্গীয় উদ্যান! সে অবাক হয়ে চারদিকে ভালো করে দেখতে লাগল। দেখতে পেল সবুজ গাছপালা, লতাপাতা। দেখল হাজারো রঙের ফুল, ফুলের বাগান। না, এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সে আগে কখনোই দেখেনি!! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই এবার সে দেখল, আশপাশে তার মতোই আরও পাঁচটি ইঁদুর। সে তো খুশিতে আত্মহারা! দীর্ঘদিনের একাকিত্ব এবার বুঝি শেষ হতে চলল; যে একাকিত্ব তাকে ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছিল।

মুগ্ধতার ঘোর না কাটতেই ইঁদুরগুলো তাকে তাদের সাথে খেলার আমন্ত্রণ জানাল। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অনেক দিন পর এত সঙ্গী-সাথি পেয়ে সে তো মহাখুশি। আনন্দের সাথে সে তাদের খেলার প্রস্তাব লুফে নিল এবং অন্যান্য ইঁদুরের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি এবং খেলাধুলার পর সে এখন ভীষণ ক্লান্ত। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় পাগলপ্রায় বলা যায়। ঠিক ওই মুহূর্তে সে দেখল, তার সামনে আগের মতোই দুই ধরনের পানীয়ের বাটি। একটির মধ্যে সাধারণ পানি, আরেকটিতে সেই নীল পানি। সে এবারও ওই নেশাজাতীয় তরলই খেল। তবে অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এখন আর সে একা নেই। তার পাঁচজন বন্ধু আছে।

এভাবে কিছুদিন চলার পর ওই নীল পানি থেকে তার মন একদমই উঠে গেল। সে আর ওই নেশা ছুঁয়েই দেখল না। কারণ, অন্যান্য ইঁদুরের সাথে খেলাধুলা করেই তো তার সময়গুলো খুব দিব্যি কেটে যাচ্ছিল, তার আর নেশা করার কী দরকার?

ওপরের গল্পটি কিন্তু কোনো রূপকথার গল্প না। সত্তরের দশকে সিমন ফসার বিজ্ঞানী ড. ব্রুস আলেকজান্ডার ইঁদুরের ওপর একটা গবেষণা চালান। গবেষণার বিষয় ছিল—ইঁদুরের ওপর মাদকের প্রভাব। গবেষণার সময় ইঁদুরগুলোকে আলাদা আলাদা অন্ধকার খাঁচায় আটকে রাখা

হতো। যেহেতু ইঁদুর একটি সামাজিক জীব, তাই এই একাকিত্ব, অন্ধকার ও বন্দিত্ব তাদের আচার-আচরণের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ইঁদুরের আচরণ পরীক্ষার জন্য খাঁচার পাশাপাশি বিশাল উদ্যানও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। খাঁচার নিঃসঙ্গ ইঁদুর সেই উদ্যানে সামাজিকভাবে বাস করার সুযোগ পেত। দুই আলাদা পরিবেশে ইঁদুরের ওপর মাদকের প্রভাব কেমন হয়, সেটা জানার জন্যই মূলত এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেল, খাঁচার একাকী পরিবেশে একটা ইঁদুর খুব দ্রুত নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, উদ্যানের সামাজিক পরিবেশে আর পাঁচটা ইঁদুরের সাথে থাকলে মাদকের ওপর তার নির্ভরশীলতা কমতে থাকে।

অর্থাৎ, মাদক ছাড়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো—পারিপার্শ্বিকতা বদলে ফেলা। শুধু ইঁদুর না, কোনো মানুষও যদি মাদক ছাড়তে চায়, তবে তাঁর একাকী জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, নিজের আচার-আচরণেও পরিবর্তন আনতে হবে। এই বই আমাদের সেই পরিবর্তনের রূপরেখা আর পথটা বাতলে দেওয়ার কাজ করবে।

মানুষ কেন পর্নাসক্ত হয়

পর্নোগ্রাফির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। আপনি যদি ইতোমধ্যেই এগুলোতে ডুবে থাকেন, তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন—এটা আপনার কোন কোন জায়গাতে ক্ষতি করছে। পর্নাসক্তি আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিতে যথেষ্ট। এটা অত্যন্ত অশালীন, অশ্লীল একটা জিনিস। একই সাথে এগুলো নৈতিকতাবিরোধী ও সমাজবিধ্বংসীও বটে! আপনারা হয়তো এও জানেন, ইসলামে এটা কত বড়ো গুনাহের একটা কাজ। এত কিছু জানার পরও পর্নাসক্তি থেকে বের হতে না পারাটা যথেষ্ট দুঃখজনক একটা ব্যাপার। পারছেন না। বাঁচার মতো বাঁচতে চাইলে আজ হোক বা কাল হোক, আপনাকে এই ভয়ংকর জগৎ থেকে বের হয়ে আসতেই হবে। ভয় নেই, এই যাত্রাপথে আপনি একা নন; আপনার সাথে আমরা আছি।

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, পর্নোগ্রাফি দেখার সময় আমাদের মস্তিষ্কে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটে। এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যত স্পষ্ট হবে, আমরা তত বেশি এসব থেকে বের হয়ে আসার অনুপ্রেরণা পাব। কথায় বলে না, বাঁচতে হলে, জানতে হবে?

কাজেই আমরা এখন জানব—পর্ন দেখার সময় আমাদের মাথায়, শরীরে বা মননে ঠিক কী কী পরিবর্তন আসে। পর্ন যখন আসক্তিতে রূপ নেয়, তখন এটা যে শুধু মস্তিষ্কেই পরিবর্তন করে, তা কিন্তু না; বরং এটা আপনার ঘুম, জেগে ওঠা, আপনার অভ্যাস, আপনার মন—সবকিছুর ওপরেই প্রভাব ফেলতে শুরু করে। স্বাভাবিক জীবনের রুটিন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তখন এর উপস্থিতি টের পাবেন। সত্যিই!

মানসিক প্রভাব

মানুষ আবেগী প্রাণী। আর আমাদের এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে শরীর থেকে উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল, যাদের আমরা হরমোন বলি। কেউ যখন নীল জগতে ডুবে থাকে, তখন তার শরীরের হরমোন নিঃসরণেও পরিবর্তন আসে। ফলে ব্যক্তির মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। আসক্তি তীব্র আকার ধারণ করলে মস্তিষ্ক থেকে এন্ডোরফিন নামক হরমোন নির্গত হতে শুরু করে। এন্ডোরফিন মূলত মানুষের মন থেকে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি দূর

করে একটা ফুরফুরে ভাব তৈরি করে। উল্লেখ্য, মাদক গ্রহণের পরেও এই এন্ডোরফিন হরমোনের প্রভাবেই মানুষের মনে কিছুটা প্রফুল্ল ভাবের সৃষ্টি হয়। তো, এই এন্ডোরফিন আমাদের শরীর নির্গত করে খুব অল্প মাত্রায়; শুধু আনন্দ আর সুখের মুহূর্তগুলোতে। আনন্দের কিছু ঘটতে দেখলেই মস্তিষ্ক সংকেত পাঠায়, সেই সংকেতের ফলেই আমাদের দেহ এন্ডোরফিন নিঃসরণ করে।

কিন্তু কেউ যখন পর্নোগ্রাফি দেখে বা মাদক গ্রহণ করে, তখন এই এন্ডোরফিন ক্রমাগত নিঃসরণ হতেই থাকে। এখন প্রশ্ন হলো—এন্ডোরফিন নিঃসরণে যখন সুখ অনুভব হয়, তবে সারাদিন এন্ডোরফিন নিঃসরণ হলে ক্ষতি কী?

উত্তর হলো—ক্ষতি আছে। ক্রমাগত এন্ডোরফিন নিঃসরিত হতে থাকলে আমাদের শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ব্যক্তি ধীরে ধীরে এন্ডোরফিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এন্ডোরফিন কমে গেলেই এদের মধ্যে তীব্র হতাশা সৃষ্টি হয়। এরা তখন আবারও পর্নোগ্রাফির মধ্যে ডুবে যায় বাড়তি একটুখানি এন্ডোরফিনের আশায়। যখনই একটু বেশি সময় আসক্ত ব্যক্তি পর্ন ছাড়া থাকে, তখনই তার মন এন্ডোরফিনের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। পর্ন দেখতে না পারলেই অস্থিরতা দেখা দেয়, সবকিছুতেই বিরক্তি ভাব চলে আসে। আবার পর্ন দেখা শুরু করলে তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। এভাবেই পর্নাসক্তি আপনার মস্তিষ্কের রাসায়নিক মানচিত্রই বদলে দেয়।

সামাজিক প্রভাব

সামাজিকতার ক্ষেত্রে পর্নাসক্তরা সাধারণত তিন ধরনের কাজ করেন।

প্রথম শ্রেণি হলো—তারা সামাজিক কর্মকাণ্ডকে সীমিত করে ফেলেন। ফলে তারা ব্যক্তিজীবনে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়েন। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বহু বছর আগে একজন সমাজবিজ্ঞানী দাবি করেছিলেন—'একজন ব্যক্তির মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য প্রতি সপ্তাহেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের প্রয়োজন।' তার দাবি ছিল—প্রতি সপ্তাহে অন্তত সাতজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না হলে কোনো ব্যক্তি (নারী/পুরুষ) মানসিক অসুস্থতার ঝুঁকিতে পড়বেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তিরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন ঠিকই, তবে সেটা চোখে যৌনতার চশমা লাগিয়ে। তাদের এই আপাত সামাজিক হওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য হলো—যৌনাচারের সুযোগ সন্ধান। এই পরিস্থিতি তাদের সোশ্যাল ইন্টারেকশন ভয়ানক (যেমন : মানসিক সমস্যা, যৌনবাহিত রোগ ইত্যাদি) হতে পারে। তবে এসব সামাজিক কর্মকাণ্ড যদি তাদের বাস্তবিক ও স্থায়ী সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সমাজে তাদের উপস্থিতি তেমন ক্ষতিকর নয়।

তৃতীয় ও সর্বশেষ শ্রেণিতে রয়েছেন এমন লোকেরা, যারা সোশ্যালি অ্যাকটিভ থাকার চেষ্টা করেন। তারা অন্যদের সঙ্গে মেশার চেষ্টা, হাসি-ঠাট্টা করেন। তবে ওপরে ওপরে মিশলেও বেশিরভাগ সময় তারা খুব বেশি ঘনিষ্ঠতাকে এড়িয়ে চলেন। কারণ, তাদের মনে হয়—তারা যদি কোনো ব্যক্তির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হন, তাহলে ওই ব্যক্তি হয়তো তার দ্বারা আহত হবেন। নিজের আসক্তির ওপরে যে তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, সেটা তারা খুব ভালো করে জানেন। তাই তারা চান না, এই আসক্তির দরুন নিজেরা আহত হোন কিংবা অন্যকে আহত করেন। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায়—তারা অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু আসক্তির কারণে তা পুরোপুরি সম্ভব হয় না।

আধ্যাত্মিক প্রভাব

পর্নাসক্তি যখন তুঙ্গে থাকে, ব্যক্তিজীবনে আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা তখন একেবারেই কমে যায়। আসক্তির সাথে বেশিরভাগ লড়াইকারী ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তারা চিন্তা করেন, আদৌ আল্লাহ কি তাদের ব্যাপারে ভাবেন? কেউ আবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করাকেই বন্ধ করে দেন। আবার এই শ্রেণির লোকেরা এতটাই লজ্জা ও অপরাধবোধে ভোগেন যে, ধর্মীয় ইবাদত থেকে নিজেকে একেবারেই দূরে সরিয়ে ফেলেন। আর এই সরিয়ে ফেলার কারণে তাদের ভেতর আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও হতাশার সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তিকে

আবারও ওগুলোর দিকে বেশি মাত্রায় ধাবিত করে। একই সাথে ব্যক্তির ভেতরের হতাশা, বিরক্তি, উৎকণ্ঠাসহ আরও অন্যান্য বাজে অনুভূতিকে প্রবলভাবে উসকে দেয়। অথচ এই আসক্তির সাথে লড়াই করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকেই স্রষ্টার সান্নিধ্যে ফিরে আসা জরুরি। কারণ, স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা মনোদ্বন্দ্ব ও আসক্তির সাথে লড়াই করার এক অতিরিক্ত ক্ষমতা ও শক্তির সন্ধান পান। কিন্তু পর্নোগ্রাফি এই শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

আর্থিক ক্ষেত্রে

আসক্তরা যখন আসক্তির খেলায় মেতে ওঠে, পর্নের পেছনে অর্থব্যয় করে তখন তাদের কাছে এগুলো খুব সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর পেছনে ব্যয় করা অর্থ পরিমাণে যত বেশিই হোক, এদের কাছে সেটা কখনোই বেশি মনে হয় না; বরং যত দাম দিয়েই হোক, এরা এই ভিডিওগুলো কেনার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। ফলে এদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অভাবের শিকার হতে হয়।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক তথ্য হলো—প্রতিবছরই পর্নোগ্রাফির পেছনে ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ সালের একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে বছর পর্নোগ্রাফির পেছনে বিশ্বব্যাপী মোট ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৬ বিলিয়ন ডলার! যার মধ্যে ১৩ বিলিয়ন ডলারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে! দিনে দিনে পর্নাসক্তি যেমন বাড়ছে, তেমন বড়ো হচ্ছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রির অর্থনীতিও। বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রির বাজার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭ বিলিয়ন ডলারে! এই বাজারের সবচেয়ে ভয়ংকর ও নির্মম সত্য হলো—আসক্ত মানুষজন খাবার কেনা বাদ দিয়ে বা ধার করে হলেও এই ভিডিও কিনতে বাধ্য হচ্ছে। একজন নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এভাবে—'আমি যখন নীল জগতে ডুবে ছিলাম, তখন খাবার না কিনে ভিডিও কিনতাম। কখনো কখনো আমার এমন পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়েছিল, হয় আমাকে খাবার কিনতে হবে, নাহয় ভিডিও। ওই পরিস্থিতিতেও আমি দ্বিতীয় অপশনটাকেই বেছে নিতাম।'

কর্মস্থলে বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে

কর্মস্থল বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো মনোযোগ। আর পর্নাসক্তি ঠিক এই জায়গাটাই পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। আসক্ত ব্যক্তিদের কর্মস্থলে বা শিক্ষাস্থলে মনোনিবেশ করতে সমস্যা হয়। যারা ইদানীং ওগুলো দেখছেন, তাদের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। সারা রাত জেগে থাকার ফলে তারা প্রায়ই দেরি করে বা ক্লান্ত হয়ে অফিসে আসেন।

একজন ভুক্তভোগী ব্যাপারটাকে এভাবে বলেছেন—'আমি গভীর রাত পর্যন্ত জাগতাম, যাতে গোপনে এসব দেখতে পারি। সময় এত দ্রুত কেটে যেত, আমার আর ঘুমানো হতো না। রাতে শুধু দু-তিন ঘণ্টা ঘুমাতাম। ফলে সব সময়ই ক্লান্ত থাকতাম, তারপরও দেখা থামতাম না।'

এই পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির পক্ষে কর্মস্থলে বা পড়াশোনায় ফোকাস করাটা কঠিন। এমনকী আসক্ত ব্যক্তিরা কাজ করতে বসে আগের রাতে দেখা ভিডিওগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেও সময় ব্যয় করেন। অথবা পরেরবার কী দেখবেন, তার পরিকল্পনা শুরু করে দেন। পর্নোগ্রাফির কারণে এই ব্যক্তিদের চাকরি হারানো কিংবা প্রমোশনে উপেক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

বইয়ের শুরুতে আমরা শুনেছিলাম ইঁদুরের গল্প, খাঁচার গল্প। যারা এই নীলের জগতে ডুবে আছেন, তারাও কি ওই ইঁদুরের মতো একটা খাঁচায় বন্দি নন? কখনো কি আমরা প্রশ্ন করেছি—আমরা কেন সেই ইঁদুরটির মতো পর্নোগ্রাফির খাঁচায় বন্দি থাকব?

পর্নাসক্তির অন্যতম কিছু কারণ

আপনারা জেনে অবাক হবেন, পর্নোগ্রাফির অন্যতম দুটি কার্যকারণ (Factor) হচ্ছে—মূল্যবোধ ও মানসিক অস্থিরতা।

পর্নোগ্রাফি ও মূল্যবোধ

মূল্যবোধ কথাটির অর্থ হলো—ভালো ও মন্দ সম্পর্কে তৈরি হওয়া সামাজিক ধারণা। শৈশবে মানুষের মন থাকে কোমল। কম বয়সে মস্তিষ্ক থাকে নমনীয়। এ সময় মানুষ সহজেই যেকোনো কিছু শিখতে পারে। আবার শৈশবের যেকোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতা মানুষের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝালে সম্ভবত বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

একটি চারাগাছের কথা কল্পনা করুন। চারাগাছ রোপণের পর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। খুঁটি যদি সোজা হয়, তবে চারাটি পরিণত বয়সে এমন বৃক্ষে পরিণত হবে, যার কাণ্ড হবে সোজা। আবার খুঁটিটি বাঁকা করে বাঁধলে গাছটিও পরিণত বয়সে বাঁকা হবে।

প্রতিটি শিশু বেড়ে ওঠার সময় নানা উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়। এটাই জীবনের কঠিন বাস্তবতা। এককথায় আমাদের মূল্যবোধ কম বয়সেই গড়ে ওঠে; বুঝে ওঠার আগেই।

আর 'যৌনতা' শব্দটির অর্থ হলো—নারী-পুরুষের পারস্পরিক জৈবিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এটি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যৌনতাবিষয়ক মূল্যবোধও অনেক সময় শৈশবকালেই গড়ে ওঠে। কম বয়সের যৌনাচার, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি মানুষের সারা জীবনব্যাপী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এই বইটি শৈশবের যৌনাচার থেকে উদ্ভূত পর্নাসক্তিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি। এ ধরনের সমস্যার জন্য মানসিক ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তবে অনুধাবন করতে হবে, আপনার পর্নাসক্তি এ ধরনের কোনো কারণে হয়েছে কি না।

প্রথমত, বুঝতে হবে—আপনি কোন কারণে আসক্ত হয়ে পড়েছেন? আপনাকে কোন জিনিস আকর্ষণ করে? প্রথমে ঠিক কোন কারণে এসব জঘন্য জিনিসগুলো দেখেছিলেন? নিজেকে এসব প্রশ্ন করে বুঝে নিতে হবে, আপনার সমস্যাটা ঠিক কোথায়। শৈশবের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আছে কি না তাও ভাবতে হবে। এ রকম চিন্তা আপনাকে মুক্তির পথ দেখাবে।

দ্বিতীয়ত, পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা আপনার আসক্তির কারণ কি না তা নিয়ে ভাবতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বে ১৯৮০-৯৫ সালে জন্মগ্রহণকারীরা হলো প্রথম প্রজন্ম, যারা তাদের বয়ঃসন্ধিকাল অনলাইনে কাটিয়েছে। ওগুলো তখনই অনেকটা হাতের নাগালে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের বিরাট একটা অংশ পর্নোগ্রাফির ফাঁদে আটকা পড়ে। তাদের অনেকের জন্যই এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাদের বাবা-মা-ও বিষয়টি বুঝতে পারেনি। কেননা, তারা ইন্টারনেট সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না।

২০১৬ সালে বারনা গ্রুপ (Barna Group) একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮-২৪ বছর বয়সি ৩৮% তরুণ এবং ১৩-১৭ বছর বয়সি ২৫% তরুণ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার নোংরা ভিডিওগুলো দেখে। অনেকের জন্যই এটা অবসরের বিনোদনে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং প্রথমে বুঝে নিন, আপনি প্রথম ক্যাটাগরিতে আছেন নাকি দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে। যদি শৈশবের কোনো দুর্ঘটনার কারণে পর্নাসক্ত হয়ে থাকেন, তবে দ্রুত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মানসিক অবস্থার কারণে পর্নোগ্রাফি

নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখা লোকজনের তুলনায় অনিয়মিত পর্ন দেখা লোকের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। যারা অনিয়মিত দেখে, তারা মূলত যেকোনো ধরনের মানসিক চাপের কারণে এই নোংরা ভিডিওগুলো দেখে। বিজ্ঞানীরা পর্নোগ্রাফির চারটি প্রধান মানসিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকে একত্রে 'HALT' বলা হয়।

১. Hungry (ক্ষুধা)

২. Angry (রাগ)

৩. Lonely (একাকিত্ব)

৪. Tired (ক্লান্তি)

অন্যান্য মানসিক কারণগুলো হলো—মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, ভয়, ডিপ্রেশন, একঘেয়েমি, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি। এসব মানসিক অবস্থায় মানুষের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে এবং সেই নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থাতেই মানুষ বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

আপনি ক্ষুধার্ত হলে অবশ্যই ক্ষুধার জ্বালা ভুলতে চাইবেন। আপনি নিঃসঙ্গ হলে একাকিত্ব আপনাকে বাজে কাজের প্ররোচনা দেবে। মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে অবশ্যই সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন। এসব অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে না পেলে তখন মানুষ ভুল পথে পা বাড়ায়।

উপরিউক্ত মানসিক অবস্থাগুলো একেবারেই সাধারণ। প্রতিনিয়তই আমাদের দুশ্চিন্তা, ভয়, একঘেয়েমি, ডিপ্রেশন, মানসিক চাপ ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হয়। এই মানসিক চ্যালেঞ্জগুলো ঠিকভাবে উতরে যেতে না পারলে আমাদের বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো—এসব মানসিক অশান্তি থেকে আমরা মুক্ত থাকব কীভাবে?

মানসিক অশান্তি থেকে বের হওয়ার কার্যকর উপায়গুলো হলো—শরীরচর্চা করা, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, ধর্মীয়গ্রন্থ অধ্যয়ন, নিকটাত্মীয়দের সাথে সময় কাটানো ইত্যাদি। তবুও মানুষ কেন মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে এসব বাজে ভিডিওগুলোর আশ্রয় নেয়? কারণ, ভিডিওগুলোর সহজলভ্যতা, সমাজে অশ্লীলতার প্রচার, কাউন্সিলিংয়ের অভাব এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি ইত্যাদি। পর্নোগ্রাফিকে সাগরের নোনা জলের সাথে তুলনা করা যায়। সমুদ্রের জল যত পান করা হয়, ততই তৃষ্ণা বাড়ে বই কমে না। ঠিক তেমনই মানসিক অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় ওগুলো দেখা সমুদ্রের জল পান করার শামিল। এতে মানসিক চাপ ও অস্থিরতা তো কমেই না; বরং আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে যায়।